গ্রন্থবীক্ষণ

‘চিরউন্মদ প্রেমপাথারে’র ষোলোটি প্রেমতরঙ্গ

তুলসীপ্রসাদ বাগচী

Asim Chaudhuri, *Vivekananda's Loving Relationship With His Brother Disciples*, Published by Asim Choudhuri (Chaudhuri Publications), Burbank, California. Distributed by Advaita Ashrama, Kolkata. 2019, pg : 372, Rs. 275.00

‘‘কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।’’ —নিউইয়র্ক থেকে স্বামীজী ‘মঠের সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে’ আবেগপূর্ণ একটি চিঠিতে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) এই স্বরচিত শ্লোকটি পাঠিয়েছিলেন। বাস্তব জীবনে তাঁকে বোধহয় ‘তারকা চর্বণ’ এবং ‘ত্রিভুবন বলপূর্বক উৎপাটন’ করার চেয়ে অনেক বেশি দুঃসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল দেশে বিদেশে। সেই গুরুভার এবং সেইসঙ্গে নিষ্ঠুর শত্রুপক্ষের প্রকাশ্য আক্রমণ ও গোপন চক্রান্তের আঘাত সামলে তাঁকে তৈরি করে যেতে হয়েছিল এমন একটি অভিনব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যা বহুযুগ ধরে তৃষিত মানবসমাজকে পরিবেশন করবে তাঁর শ্রীগুরুদেবের অমৃতবাণী এবং একইসঙ্গে, সেই অমৃতবাণীর ফলিত রূপ হিসেবে প্রাত্যহিক জীবনে ‘শিবজ্ঞানে জীবসেবা’-র আদর্শকেও মূর্ত করে তুলবে। কপর্দকহীন সন্ন্যাসীকে সেই দুরূহ কাজটি করতে হবে, হবেই, কারণ এটাই ছিল তাঁর গুরু মহারাজের আজ্ঞা, গুরুমাতার অন্তরের ইচ্ছা। স্বল্পায়ু মর্ত্যজীবনে (মাত্র ঊনচল্লিশ বৎসর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন) তিনি বহিরঙ্গ কাজে সক্রিয় ছিলেন মাত্র নয় বছর (১৮৯৩-১৯০২)। অবশ্য পুরো নয় বছরও তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার কাজ করতে পারেননি। অবিরাম বক্তৃতা, অনুরাগী ও শিষ্যদের জন্য ক্লাস নেওয়া, প্রচারকার্যে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে পরিব্রাজন, বই-প্রবন্ধ-চিঠিপত্র লেখা, জটিল সাংগঠনিক কাজকর্ম ইত্যাদি ছাড়াও ছিল শারীরিক অসুস্থতা, একাধিকবার সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা, স্বাস্থ্যোদ্ধারের কারণে বাধ্য হয়ে বিশ্রামগ্রহণ। অল্পসময়ের মধ্যে এতসব গুরুদায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে গেলে একান্তভাবেই প্রয়োজন তাঁর সকল নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী গুরুভাইদের—‘রামকৃষ্ণদাস’-দের—সক্রিয় যোগদান। না হলে স্বামীজীর একার পক্ষে এই গুরুদায়িত্ব বহন করা দুঃসাধ্য হত।

পক্ষান্তরে, এও তো ঠিক যে তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভাইরা নিজেরা সাধনভজন করার জন্যই ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, সুকঠিন সন্ন্যাসের ক্ষুরধার পথ বেছে নিয়েছিলেন নিজেদের মুক্তির

জন্য। এই সংসারত্যাগীরা তাহলে কোন দুঃখে আবার এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গিয়ে নানারকম পার্থিব কাজে জড়িয়ে পড়বেন?

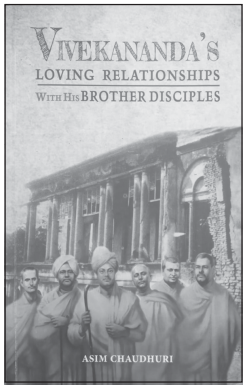

তার উত্তরে বোধহয় বলা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যেরা কেউই সাধারণ ছিলেন না, তাঁরাও যুগাবতারের লীলাসঙ্গী ছিলেন। যুগপ্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সশক্তিক এই দুঃখজর্জর ধরণীর ধূলিতে জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি শুধু স্বামীজীকেই নয়, তাঁর অন্যান্য শিষ্যদেরও—সন্ন্যাসী-গৃহী নির্বিশেষে—সঙ্গে করে এনেছিলেন তাঁর সুবিশাল জীবোদ্ধার-মিশনের কাজে সহায়তা করতে। তাই, কেবল স্বামীজীই নন, ঠাকুরের সকল শিষ্যই ঠাকুরের কাছে, ঠাকুরের মিশনের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। স্বামীজীর মহামনা গুরুভ্রাতাদের সমস্ত পার্থিব কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল তাঁদের অন্তরের কল্যাণচিকীর্ষা। এই কারণেই তাঁদের প্রায় সকলেই স্বামীজীর মহাসমাধির পরেও স্বামীজীর আরব্ধ এবং নির্দেশিত কাজে নিযুক্ত ছিলেন আমৃত্যু।

কিন্তু, কেমন ছিল তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক? আগাগোড়া সবটাই কি একটি নিঃশর্ত, নিঃশব্দ এবং নিঃশেষ আত্মসমর্পণের সুমধুর ইতিবৃত্ত? না কি, কখনও কখনও বহমান প্রেমনদী গুরুভাইদের জিজ্ঞাসা-ঝটিকায় তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠত, দেখা দিত ভাব-সংঘাতের ঘূর্ণাবর্ত, মাথা তুলত প্রতিবাদের অমসৃণ সুতীক্ষ্ণ প্রস্তরপিণ্ড? না, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের তাঁদের গুরুদেবের নামাঙ্কিত নবনির্মিত প্রতিষ্ঠানের (রামকৃষ্ণ মিশন) সঙ্গে যুক্ত করে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা'র তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার সুমহান কাজটি প্রথমদিকে খুব সহজ ছিল না। অনেকেই সেই সময়ে স্বামীজীর এই সেবাধর্মের অভিনব আদর্শকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে চাননি। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীজীকে তাই কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা সংশয় ও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'-বাদী, বিবিক্তসেবী, বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরা কেন সাংগঠনিক কাজে জড়াবেন? স্বামীজী তাঁর অপার শাস্ত্রজ্ঞান এবং ক্ষুরধার মেধার সাহায্যে সেইসব সংশয়পূর্ণ প্রশ্নের সুমীমাংসা করতে পেরেছিলেন তাত্ত্বিকভাবে। যখন তাতেও কাজ হয়নি, তখন তাঁকে প্রয়োগ করতে হয়েছিল তাঁর অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র, যার অপর নাম—ভালবাসা, স্নেহ, প্রেম। 'প্রেম, প্রেম, এইমাত্র ধন'—এছাড়া তো আর কিছুই নেই সর্বস্বত্যাগী স্বামীজীর! অকাতরে সেই প্রেমধন বিলিয়েই তাঁকে পনেরো জন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাকে সম্মত করতে হয়েছিল। স্বামীজীর সর্বগ্রাসী প্রেমপাশে ধরা দিয়ে এবং সর্বসম্মতভাবে তাঁকে 'নেতা' বলে মেনে নিয়ে তাঁরাও 'গুরু মহারাজে'র যুগধর্মপ্রচারের 'মিশন'কে সফল করতে ব্রতী হয়েছিলেন। কীভাবে সেইসব সাময়িক ভাব-সংঘাতের ঘূর্ণাবর্ত মিলিয়ে যেত, কীভাবেই বা প্রতিবাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডগুলি অনতিবিলম্বে ভেসে যেত স্বামীজীর প্রবল ব্যক্তিত্ব এবং প্রবলতর প্রেমের কূলপ্লাবী বন্যাস্রোতে? এই স্বল্পালোচিত (বা বলা যেতে পারে, অনালোচিত) বিষয়টি নিয়ে বহু অধ্যয়ন ও গবেষণা করেছেন মাননীয় শ্রীঅসীম চৌধুরী।

সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে এই বিদ্বান লেখকের লেখা আগের পাঁচটি অসামান্য বই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বিবেকানন্দ-গবেষণায় সিস্টার গার্গীর সুযোগ্য উত্তরসূরি শ্রীচৌধুরী ইতঃপূর্বে এক সুকঠিন—প্রায় অসম্ভব—কাজ করেছেন। সিস্টার গার্গী স্বামীজীর পাশ্চাত্য-জীবন নিয়ে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে বিশালায়তন বই লিখেছেন (ছয়

খণ্ডে)। তারপর স্বামীজীর ইওরোপ-বাস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন আমেরিকান সন্ন্যাসী স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ। তাঁর সেইসব গবেষণা ‘Prabuddha Bharata’ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়েছিল। পরে সেগুলি সংকলিত করে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয় (বাংলায় এবং ইংরেজিতে)। সেসব অনুপুঙ্খ গবেষণাগ্রন্থ এবং ওই জাতীয় কিছু প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছিল যে স্বামীজীর পাশ্চাত্যবাস নিয়ে সব কথাই তো লেখা হয়ে গেল, আর নতুন কথা কী-ই বা থাকবে? থাকলেও, সেটি বড় জোর একটি দীর্ঘায়ত প্রবন্ধের আকার নিতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু ‘‘শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?’’ স্বামীজীও অশেষ, তাঁর কাজকর্মের ইতিহাসও তাই অশেষ হতে বাধ্য। এটাই প্রমাণ করলেন আমেরিকা-প্রবাসী লেখক অসীম চৌধুরী মহাশয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞান—এই দুই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শ্রীচৌধুরী তাঁর সমগ্র কর্মজীবন কাটিয়েছেন আমেরিকার ‘ক্যাটারপিলার ইনকর্পোরেটেড’ নামক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে (এটি একটি American Fortune 100 Corporation)। প্রযুক্তি, গবেষণা, গুণমান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে কর্মব্যস্ত লেখকের সংকুচিত অবসরটুকু নিযুক্ত হয়েছে কষ্টসাধ্য বিবেকানন্দ-গবেষণায়। বিভিন্ন দেশ ঘুরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি খুঁজে বার করেছেন আরও অনেক অজানা তথ্য। এর ফলে আমরা পেয়েছি স্বামীজীর পাশ্চাত্য-জীবন নিয়ে তিনখানি সুবিশাল বই, যাদেরকে স্বচ্ছন্দে প্রাগুক্ত বইদুটির পরিপূরক বলা যায়। কিন্তু সেখানেই থেমে যায়নি এই উৎসাহী বিবেকানন্দ-সেবকের অক্লান্ত লেখনী। নিজের শিক্ষাগত জ্ঞান ও পেশাগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এবারে আলোকপাত করলেন আরও দুটি নতুন বিষয়ের ওপর (এই দুটি বিষয়েই তাঁকে পথিকৃতের সম্মান দিতে দ্বিধা নেই)। প্রথম বইটিতে (Vivekananda–A Born Leader) তিনি আধুনিক ম্যানেজমেন্ট শাস্ত্র অনুসারে স্বামীজীর অনন্য নেতৃত্বগুণের বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় বইটি জটিল বিষয় নিয়ে লেখা : ‘Vivekananda–The Ultimate Paradox Manager’, যেখানে তিনি সুনিপুণভাবে স্বামীজীর কূটাভাষ নিয়ন্ত্রণকৌশলের (Paradox Management) অন্তর্নিহিত রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। এই দুরূহ কাজটি করতে গিয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানের এক জটিলতর শাখার সাহায্য নিয়েছেন, যার নাম ‘বোধগম্যতার ঐক্যহীনতা’ (cognitive dissonance)।

তারপর শ্রীচৌধুরী গবেষণার জন্য বেছে নিয়েছেন আর একটি অভিনব এবং জরুরি বিষয়—স্বামীজী এবং তাঁর পনেরো জন গুরুভ্রাতার পারস্পরিক সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। যথার্থ বিদ্বান ও আধ্যাত্মিক সাধকের মতো যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে লেখক জানিয়েছেন যে এই জটিল বিষয়টি নিয়ে গবেষণাকর্মে লিপ্ত হওয়ার আগে তিনি নিজেও মানসিকভাবে এক ধরনের বোধগম্যতার ঐক্যহীনতার (cognitive dissonance) শিকার হয়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত লেখক নিজের কল্পিত সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে নিজেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ‘‘বিজ্ঞ যেথা ভয় পায়, মূর্খ সেথা আগে যায়।’’ আমাদের সৌভাগ্য, অসীমবাবু তাঁর অসীম বিদ্যানুরাগ এবং স্বামীজী-ভক্তির প্রভাবে সেইসব প্রাথমিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে এই কাজটি শেষ করতে পেরেছেন। সুদূর আমেরিকায় বসে গবেষক-সুলভ পরিশ্রম করে লেখক বহু তথ্য (চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণা, কথোপকথন, জীবনী ইত্যাদি) সংগ্রহ করেছেন, ভক্তসুলভ ধৈর্য নিয়ে সেগুলি দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করেছেন। তারপরে সেগুলি বৈজ্ঞানিক-সুলভ নির্মোহ দৃষ্টিতে সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে

স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর পনেরো জন সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতার সপ্রেম সম্পর্কের ওপরে আলোকপাত করেছেন সুললিত ও সংযত ভাষায় (এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার জন্যও তাঁকে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যেতে পারে)। লেখকের এই কঠিন তপশ্চর্যার সুফল ভোগ করছি আমরা। এই বইটি পড়তে পড়তে আমরাও কখন যেন লেখকের সঙ্গী হয়ে এক অদৃশ্য টাইম মেশিনে বসে পৌঁছে যাই সেই দিব্যলোকে যেখানে স্বামীজী আর তাঁর গুরুভ্রাতাদের নিত্যলীলা চলেছে অদ্যাপি, যা 'কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'।

আরও একটি দিক থেকে এই বইটি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী-সংক্রান্ত অধিকাংশ বইতে আমরা কেবল নব্যবেদান্তের মহাঋষি স্বামীজীর ধীরোদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে পথপ্রদর্শক স্বামীজীর দেখা পাই, গুরুরূপী স্বামীজীর গুরুগম্ভীর পাবনমূর্তি দেখে ধন্য হই। উত্তর কলকাতার সিমলেপাড়ার মজলিশি ও কৌতুকপ্রিয় মানুষটি সেখানে স্বাভাবিকভাবেই চাপা পড়ে গেছেন পরিত্রাতা স্বামীজীর জ্যোতির্ময় মূর্তির নিচে। স্বামীজীর সেই সহজ সরল সদানন্দময় মূর্তির কিছুটা পরিচয় আমরা পেতে পারি যদি আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্পর্ক কেমন ছিল তার দিকে দৃষ্টিপাত করি। শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্নেহ, কৌতুক, উদ্বেগ, অনুপ্রেরণা, ভর্ৎসনা, বন্ধুত্ব, অভিভাবকত্ব —এইসব মিলিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর গুরুভাইদের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। স্বামীজী একাধারে তাঁর গুরুভাইদের পিতা, নেতা, ভ্রাতা এবং প্রয়োজনে রক্ষাকর্তা। সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে এই রকম অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়; অথচ এই বিষয়টি নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয়নি, অনেক চেষ্টা করে কেবল একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছি।[১] যাইহোক, সেসব পরিচিত-অপরিচিত তথ্য একত্র করে, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আলোকে সেগুলি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরেই ছিল। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আলোচ্য গ্রন্থটি সেই অভাব বহুলাংশে পূর্ণ করল।

এবারে বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক। লেখক-প্রকাশকের ভূমিকা, ম্যানেজমেন্ট-বিশেষজ্ঞ পদ্মভূষণ ড. মৃত্যুঞ্জয় আত্রেয়র লেখা একটি সারগর্ভ প্রাগ্‌বাণী (Foreword) এবং লেখকের বিস্তারিত ভূমিকা ছাড়াও বইটিতে আছে ষোলোটি অধ্যায়। প্রতিটি অধ্যায় স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুখপাঠ্য এবং সবিস্তারে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু স্থানাভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে না, তাই সামান্য দু-একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করছি। বইয়ের ভূমিকায় লেখক জানাচ্ছেন—সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্বামীজীর সপ্রেম সম্পর্কের রহস্য বোঝবার জন্য অনেক ভাবনাচিন্তা করে তিনি পাঁচটি বিশেষ মানদণ্ড (metric) ঠিক করে নিয়েছেন—

১। চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে স্বামীজী ছিলেন অক্লান্ত। তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর প্রায় সকল গুরুভাইকে ইংরেজি এবং বাংলায় চিঠিপত্র লিখতেন (কয়েকবার মজা করে ফরাসি ভাষাতেও চিঠি লিখেছিলেন!)। তার মধ্যে বেশ কিছু চিঠি হারিয়েও গেছে। যাইহোক, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত গুরুভ্রাতাদের উদ্দেশে লেখা স্বামীজীর একশো তিনটি চিঠি (নব্বইটি বাংলায় এবং তেরোটি ইংরেজিতে) শেষ পর্যন্ত কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, সুবোধানন্দ এবং বিজ্ঞানানন্দকে লেখা কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি। তিনি কাকে কোন পরিস্থিতিতে কতগুলি চিঠি লিখেছেন, সেইসব চিঠির মূল সুর এবং বক্তব্য কী ছিল—এইসব তথ্য আলোচ্য বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এখানে স্বামীজী সরাসরি তাঁর প্রাণপ্রিয় গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে

প্রাণ খুলে কথা বলছেন, বহুরূপে তাঁদের সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছেন—শিক্ষক, নেতা, প্রেরণাদাতা, মানবপ্রেমিক, বন্ধু এবং মজলিশি স্বামীজী সবাই যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন তাঁর পত্রসাহিত্যের মহাজগন্নাথক্ষেত্রে। এই চিঠিগুলি স্বামীজীর অনুগামীদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার উৎস।

২। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের সম্পর্কে যা যা মন্তব্য করেছেন, অথবা তাঁর গুরুভাইরা এই বিষয়ে যা কিছু বলেছেন।

৩। পরবর্তী কালে তাঁর গুরুভাইরা স্বামীজী সম্বন্ধে যেসব স্মৃতিচারণা করেছেন।

৪। স্বামীজীর ফলিত-বৈদান্তিক ভাবসম্পদ এবং তাঁর অভিনব সেবাধর্মের প্রবর্তনকে কে কতটা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তদনুসারে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

৫। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সর্বাধিনায়ক স্বামীজী নিজে কার সঙ্গে কতটা তীব্রভাবে যুক্ত ছিলেন।

এর সঙ্গে আর একটি কৌতুকময় মানদণ্ডও যোগ করা যেতে পারত। সেটি হচ্ছে গুরুভাইদের বিচিত্র নামকরণ! অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, ‘‘নামরহস্যে স্বামীজীর বিশেষ প্রীতি ছিল। মজাদার একটা নতুন নাম না-দেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি ছিল না।... বিদ্রূপ-কৌতুক-স্নেহ-শ্রদ্ধা—সবকিছুর স্বাক্ষর পাওয়া যায় তাঁর দেওয়া নামগুলির মধ্যে।’’ গুরুভাইদের অদ্ভুত সব নামকরণ করতেন তিনি, তার মধ্যে ‘মহাপুরুষ’, ‘রাজা’, ‘প্লেটো’ থেকে শুরু করে ‘ভেঁপু’, ‘গ্যাঞ্জেস’, ‘কেলো’, ‘কেলুয়া-ভুলুয়া’ ‘শরতা শালা’—ইত্যাকার অনেক রকমের নামাবলিই রয়েছে। কিন্তু কেবল হাসি-মজা-কৌতুকেই স্বামীজীর নামকরণ সীমাবদ্ধ নয়—‘‘গুরুভাইদের সন্ন্যাসী-নাম স্বামীজীরই দেওয়া। নামগুলি অদ্ভুত সার্থক। সুগভীর সুগম্ভীর আধ্যাত্মিকতাকে নাম দিয়েছিলেন ‘ব্রহ্মানন্দ’; ঈশ্বরের এবং মানবের প্রতি ভক্তিপ্রেমে বিহ্বল মানুষটিকে—‘প্রেমানন্দ’; শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিতকে—‘রামকৃষ্ণানন্দ’ [স্বামীজীর নিজের এই নামটি নেবার ইচ্ছে ছিল]; জননী সারদার দ্বারপালকে—‘সারদানন্দ’; যোগতন্ময়তাকে—‘যোগানন্দ’; শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সৃষ্টিকে—‘অদ্ভুতানন্দ’; অভেদবাদী বৈদান্তিককে—‘অভেদানন্দ’; তুরীয় প্রজ্ঞাসীনকে—‘তুরীয়ানন্দ’; আনন্দময় শিব-স্বরূপকে—‘শিবানন্দ’; বস্তুবিজ্ঞানের উত্তম ছাত্র এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানে সিদ্ধ ব্যক্তিকে—‘বিজ্ঞানানন্দ’; অখণ্ড পবিত্রতাকে ‘অখণ্ডানন্দ’—এমনি সব নাম।’’[২] এইসব সিরিয়াস এবং মজার নামকরণের মধ্য দিয়ে গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্বামীজীর গভীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্বীকৃতির অভ্রান্ত নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের প্রতি স্বামীজীর সপ্রেম সম্পর্ক নিয়ে বিশদে আলোচনা করার আগে লেখক প্রেমের নানাবিধ রূপ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন প্রথম অধ্যায়ে (The Types of Love)। থিসিস-তুল্য এই লেখাটির ভিত্তি হচ্ছে C.S. Lewis (১৮৯৮-১৯৬৩)-এর লেখা একটি বিখ্যাত বই—The Four Loves। লিউইস-কথিত চার রকম প্রেমের রূপকে (Eros, Affection, Friendship, Charity/Agape) বিচার করেছেন লেখক। সংগত কারণে, লেখক প্রেমের প্রথম রূপটিকে (Eros)—যা একান্তই দেহগত—আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছেন। প্রেমের চতুর্থ রূপটি (Charity বা Agape) হচ্ছে একেবারে দিব্যস্তরের ভালবাসা (Divine Love) বা ঈশ্বরপ্রেম, যা প্রেমের চূড়ান্ত রূপ। স্বামীজী এবং তাঁর গুরুভ্রাতাদের পার্থিব সম্পর্কের মধ্যে যে-সুগভীর ভালবাসার অপূর্ব প্রকাশ আমরা দেখতে পাই তা তাঁদের এই সীমাহীন দিব্যস্তরের ভালবাসারই একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাঁরা পরস্পরকে ঈশ্বরজ্ঞানেই দেখতেন এবং

ভালবাসতেন—এই মূল কথাটি মনে রেখে প্রেমের এই চতুর্থ (Charity/Agape) রূপটিকেও আলোচনার বাইরে রেখেছেন লেখক। এই দুই ধরনের প্রেমকে (দেহগত এবং দিব্যস্তরের) বাদ দিয়ে, একবারে পার্থিব দৃষ্টিতে স্বামীজীর ভ্রাতৃপ্রেমকে তিনি দুটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত করেছেন—বন্ধুত্ব (Friendship) এবং স্নেহ (Affection)। এইসঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মসাধনায় ঈশ্বরপ্রেমের যে-পঞ্চভাবের (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) কথা বলা হয়, তারও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। স্বামীজী প্রেমের বিষয়ে যে-চরম কথাটি বলেছিলেন তাঁর 'মানবীয় ভাষায় ভগবৎপ্রেমের বর্ণনা' শীর্ষক ভাষণে ('ভক্তিযোগ' গ্রন্থের 'পরাভক্তি' অংশের অন্তর্গত), সেটিও উল্লেখ করেছেন।

পরবর্তী পনেরোটি অধ্যায়ে (দ্বিতীয় থেকে ষোড়শ) আলাদা-আলাদাভাবে লেখক দেখিয়েছেন যে প্রতিটি গুরুভ্রাতার সঙ্গে তাঁদের মানসিকতা ও বয়স অনুসারে স্বামীজীর বাহ্যিক ব্যবহার কীরকম হত। আর সেটাই তো স্বাভাবিক, কারণ 'অভিন্নহৃদয়' বন্ধু স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলবেন, বয়ঃকনিষ্ঠ স্বামী সুবোধানন্দ বা বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে তো তিনি ঠিক সেইভাবে কথা বলবেন না। অথচ তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি স্বামীজীর অন্তরের ভালবাসার কোনও তারতম্য হত না।

এই গ্রন্থের মূল আলোচনা শুরু হচ্ছে (দ্বিতীয় অধ্যায়) স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর সখ্যমধুর সম্পর্ক দিয়ে। প্রথমেই একটি ভাবঘন ঘটনার কথা মনে পড়ছে। প্রথমবার পাশ্চাত্যে বেদান্তবাণী প্রচার শেষ করে পাঁচ বছর পরে স্বামীজী আবার তাঁর নিজের শহর কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সকালবেলা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছলেন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭)। স্বেচ্ছাসেবক কুমুদবন্ধু সেনের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারছি : ''আমরা জয়ধ্বনি করতে করতে পশুপতি বোসের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি টেনে নিয়ে গেলাম। সেখানেও পুষ্পসজ্জিত বিরাট তোরণ। ফটকের সামনে পশুপতি বোস প্রভৃতি স্বামীজীকে প্রণাম করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেইসময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দ সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর গলায় পুষ্পমালা পরিয়ে দিলেন। স্বামীজী দুজনকেই প্রণাম করলেন, বললেন, 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু'। মহারাজও যোগ্য উত্তর দিলেন, 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম[ঃ] পিতা'।''[৩] এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে স্বামীজী আর তাঁর গুরুভ্রাতাদের পারস্পরিক সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য। গুরুভাইরা জ্ঞানে গরিমায় আধ্যাত্মিকতায় শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বামীজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে এক করে পিতৃরূপে দেখতেন। আর, অহংশূন্য স্বামীজীও তাঁর প্রিয় গুরুভাইদের 'গুরুবৎ' দেখতেন। সকল গুরুভাইকে গুরুদৃষ্টিতে দেখলেও ব্রহ্মানন্দজীকে তিনি বিশেষ প্রীতির চোখে দেখতেন, কারণ তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক পুত্র, তাঁর আদরের 'রাখাল'! তাঁর এই 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' সম্বোধন তাই বিশেষভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিই উদ্দিষ্ট।

এই বইটিতে অনেক জটিল বিষয়ে আলোচনা সত্ত্বেও লেখকের ভাষা কিন্তু মোটেই 'শুষ্কং কাষ্ঠং' জাতীয় নয়, মধ্যে মধ্যে তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা জানি, নরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ১২ জানুয়ারি ১৮৬৩, আর রাখালচন্দ্র জন্মেছিলেন ২১ জানুয়ারি ১৮৬৩। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন—নরেন্দ্রনাথকে পৃথিবীতে পাঠাবার পরে রাখালচন্দ্রকে পৃথিবীতে পাঠাতে জগন্মাতা দীর্ঘ নয়দিন সময় নিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি কৌতুক করে বলেছেন, সর্বগুণাধার শিশু-নরেনকে পৃথিবীতে পাঠাবার পরে শিশু-রাখালের মধ্যে আর

নতুন কী কী গুণের সমাবেশ ঘটাতে পারেন সেটা স্থির করবার জন্যই তিনি নয়দিন ধরে ভাবনাচিন্তা করেছিলেন। শেষপর্যন্ত তিনি রাখালের মধ্যে এমন সব গুণের সঞ্চার করলেন যা নরেন্দ্রনাথের দেহাধারে প্রদত্ত গুণরাজির পরিপূরক হতে পারে। ফলে, পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র—তাঁদের মানসিক গঠনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও—পরস্পর পরিপূরক হয়ে যুগপ্রয়োজনে জগন্মাতার কাজ (শ্রীরামকৃষ্ণের নববেদান্তবাণী প্রচার) সুন্দরভাবে করতে পেরেছিলেন। আবার এই ‘কাজে’র প্রয়োজনেই স্বামীজী কখনও ধৈর্যহারা হয়ে গুরুভাইদের কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করতেন। রুদ্রমূর্তি স্বামীজীর সেই রুদ্ররোষের একটা বৃহৎ অংশ এসে পড়ত নিরীহ শান্ত ব্রহ্মানন্দজীর ওপর। কখনও কখনও অন্য কোনও গুরুভ্রাতাকে স্বামীজীর ক্রোধানল থেকে বাঁচাবার জন্যও ব্রহ্মানন্দজী তাঁদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কর্মশৈথিল্যের দায় অম্লানবদনে নিজের ওপর নিয়ে নিতেন এবং তার অবধারিত পুরস্কার-স্বরূপ স্বামীজীর অধিকতর বাক্-তাড়নার অধিকারী হতেন। কাজে-কর্মে কোথাও কোনও শৈথিল্য বা বিচ্যুতি দেখলেই স্বামীজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত এবং শুরু হত তাঁর রুদ্রতেজের উদ্‌গীরণ, সেটা স্বামী ব্রহ্মানন্দের মতো বিশাল আধার ছাড়া অন্য কেউই ধারণ করতে পারতেন না। হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা?

ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পরে স্বামীজী হয়তো নিজের আচরণের কথা ভেবে ক্ষমাপ্রার্থনাও করতেন, কিন্তু তার পরে আবার কোনও একটা কারণে তাঁর অসন্তোষ ঘটলে ওই একই উত্তপ্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত। কর্মক্লান্ত ও ব্যাধিজীর্ণ স্বামীজী একবার নিজের এইসব অসংগত কাজের জন্য খুবই অনুতপ্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দজীকে একটি চিঠিতে (১১ অক্টোবর ১৮৯৭) কাতরভাবে লিখেছিলেন, ‘‘... এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই।... তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি, বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেউ নেই যে সব সইবে। তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে—কর্ম!... তোমরা মাপ করতে হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো।...’’

স্বামীজীর অকাল প্রস্থানের পরে ব্রহ্মানন্দজীর (এবং অবশ্যই স্বামী সারদানন্দজীর) সুযোগ্য নেতৃত্বে স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত শিশু প্রতিষ্ঠানটি বহুবিধ প্রতিকূলতা কাটিয়ে ক্রমেই এগিয়ে গেছে।

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে পাচ্ছি স্বামী যোগানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্কের বিষয় আলোচনা। স্বল্পায়ু যোগানন্দজী তাঁর দুর্বল শরীর নিয়ে স্বামীজীর বিশাল ও বহুধাবিস্তৃত কর্মযজ্ঞে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেননি সত্য, কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়েও বসে থাকেননি। ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে তিনি যথাশক্তি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। ১ মে ১৮৯৭ তারিখে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে আয়োজিত একটি বৈঠকে স্বামীজী ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলকাতা কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁর সহকারী হলেন। যোগানন্দজীর কাছে অন্তত দুটি ব্যাপারে আমাদের সদা-কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। প্রথমত, শান্ত নিরীহ মৃদুভাষী যোগীন মহারাজ সেদিন স্বামীজীকে সাহস করে একটি কঠিন প্রশ্ন করেছিলেন আর তাঁর সেই প্রশ্নে ভাবোদ্বেল হয়ে স্বামীজী যা উত্তর দিয়েছিলেন, সেটি চিরস্মরণীয়। সভাভঙ্গের পরে পরিতৃপ্ত স্বামীজী ‘‘যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়!’’ প্রত্যুত্তরে সোৎসাহ সমর্থনের পরিবর্তে যোগানন্দজী নিক্ষেপ করলেন এক প্রখর প্রশ্নবান : ‘‘তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে

কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এ-রকম ছিল?" তার উত্তরে স্বামীজী যা বললেন, তা চিরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামীদের এক অভিনব দিগ্‌দর্শনী হয়ে থাকবে। দিব্যদর্শী স্বামীজীর কণ্ঠে সেদিন বেজেছিল এক সুগভীর সুর—"তুই কি করে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে তোরা তোদের গণ্ডিতে বুঝি বদ্ধ করে রাখতে চাস? আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।... তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্যান্য উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি করে জীবকে তা শিক্ষা দিতে হবে। অনন্ত মত, অনন্ত পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে আর একটি নূতন সম্প্রদায় তৈরি করে যেতে আমার জন্ম হয়নি।... ত্রিজগতের লোককে তাঁর [সেই অনন্ত] ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।... কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেছে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর ভাবের ইয়ত্তা নেই।..."[৪]

যোগানন্দজীর সংশয়পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে এত সব কথা স্বামীজী যত্ন করে না বোঝালে আমরা কি অনন্তভাবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের এই বিশ্বতোমুখী তাৎপর্য সম্বন্ধে জানতে পারতাম?

দ্বিতীয়ত, যোগানন্দজী স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাঙ্গীণ সেবার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, নিঃসন্দেহে এটি স্বামীজীর খুব প্রিয় কাজ। তিনি নিজে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে জগজ্জননীর সেবাই শুধু করেননি, গুরুভাই শরৎকেও মাতৃসেবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এর ফলে, তাঁর অকালপ্রয়াণের পর শরৎ মহারাজ এই মহাকার্যের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে মাতৃসেবার এক কল্পনাতীত উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর উচ্চাবচ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা রয়েছে। পরিণত বয়সে প্রেমানন্দজীর অন্যতম (এবং সম্ভবত সবচেয়ে প্রিয় কাজ) ছিল সমাগত 'যুবকগণকে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত করা।' স্বামীজীর কথা বলতে গেলেই তিনি ভাববিহ্বল হয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠতেন। নিরঞ্জনানন্দজীর কথা বলা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। 'মূর্তমহেশ্বর' বীরেশ্বর বিবেকানন্দের সঙ্গে শিবস্বরূপ স্বামী শিবানন্দজীর শ্রদ্ধাঘন সম্পর্ক ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। স্বামীজীর সেবাধর্মের পথ তাঁর যে-কয়েকজন গুরুভ্রাতা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহাপুরুষ মহারাজ। আর একটি অনন্য কাজের জন্য শিবানন্দজী শুধু রামকৃষ্ণ সঙ্ঘেরই নয়, সকল ভক্তমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন—স্বামীজীর পূজার প্রচলন হয়েছিল তাঁর দ্বারা। স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের কিছুদিন পরেই ঠাকুরের ছবির ডান পাশে স্বামীজীর ছবি বসিয়ে তিনি স্বামীজীর পূজা করেছিলেন। গুরুর পাশে গুরুভ্রাতাকে বসিয়ে তাঁর পূজা করার দৃষ্টান্ত আর আছে কী না জানি না।

স্বামীজী-সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ স্বামী সারদানন্দজী ও স্বামীজীর পারস্পরিক সম্পর্ক সপ্তম অধ্যায়ের উপজীব্য। সুকঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও নিত্য ঠাকুরপূজার আয়োজন করতেন যিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বীরভক্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী এবং স্বামীজীর সম্পর্কের ওপরে বিস্তৃত আলোকপাত করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। অবশ্যপাঠ্য এই অধ্যায়ের শেষের দিকে লেখক জানিয়েছেন যে একটি কারণে শশী মহারাজ আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। মহাপ্রয়াণের মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাঁচটি অপূর্ব শ্লোক ['বিবেকানন্দপঞ্চকম্'] লিখে যেন পঞ্চপ্রদীপে স্বামীজীর শেষ আরতি করে গেলেন। সেই 'বিবেকানন্দপঞ্চকম্'-এর পরেই রয়েছে ষষ্ঠ শ্লোক যা স্বামীজীর প্রণামমন্ত্ররূপে

গৃহীত—‘‘নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।/ সচ্চিৎসুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে॥’’ আমরা যখন এ-মন্ত্রটি উচ্চারণ করে স্বামীজীকে প্রণাম করি, তখন সবার অলক্ষ্যে আমাদের আর স্বামীজীর মধ্যে এসে দাঁড়ান রামকৃষ্ণানন্দজী, আমাদের শিখিয়ে দেন কীভাবে স্বামীজীকে প্রণাম করতে হবে।

নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক। নিভৃতচারী অদ্ভুতানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর প্রেমপূর্ণ সম্পর্কের কথা পাচ্ছি দশম অধ্যায়ে। লাটু মহারাজ স্বামীজী-প্রবর্তিত কঠোর নিয়মাবলি মেনে চলতে চাইতেন না। বারবার তিনি স্বামীজীর বিরুদ্ধে রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে মঠ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেন। এদিকে তাঁর বিশেষ স্নেহের গুরুভাই ‘লেটো’কে ছেড়ে দিতেও স্বামীজীর প্রাণ চাইত না। সঙ্ঘনেতা ও নিয়মপ্রণেতা স্বামীজীর পক্ষে এটা একটা কঠোর চ্যালেঞ্জ ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিয়মনিষ্ঠ নেতা-স্বামীজী স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করতেন প্রেমিক-স্বামীজীর কাছে। তিনি লাটু মহারাজকে সবরকম নিয়মের নিগড় থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর নিজের ভাবে থাকতে দিতেন। এর পেছনে স্বামীজীর ভালবাসা তো ছিলই, তার সঙ্গে এও স্বামীজী জানতেন যে আপসহীন তাপস লাটু মহারাজের তপোদীপ্ত উপস্থিতি মঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশকে সমৃদ্ধতর করবে।

স্বামীজীর ‘মহা অনুগত’ ও প্রিয় ‘হরিভাই’, অর্থাৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের সবিস্তার ব্যাখ্যান একাদশ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। অদ্বৈতানন্দজী প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের ভাবপ্রচারে খুব বেশি সক্রিয় ভূমিকা নেননি; যদিও স্বামীজী তাঁর এই প্রবীণ গুরুভ্রাতাটির সুশৃঙ্খল কর্মশৈলীর কথা মনে রেখে তাঁকে সঙ্ঘের অছি পরিষদের সদস্য করেছিলেন (পরে তিনি কিছুকাল সঙ্ঘের সহ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন)। পঁয়ত্রিশ বছরের বড় গুরুভ্রাতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, কৌতুকে ভরপুর। আরও উল্লেখ্য, স্বামীজী কখনও তাঁর প্রিয় ‘গোপালদা’কে তাঁর রুদ্ররূপ দেখাননি। অবশ্য সেটা কেবল বয়সের খাতিরেই নয়। কাজেকর্মে ত্রুটি দেখলেই স্বামীজীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত আর ‘অপরাধী’ ব্যক্তিটির—তিনি যেই হোন—ওপরে ভর্ৎসনার অগ্নিস্রোত বয়ে যেত। কিন্তু ঠাকুরের কাজে নিবেদিতপ্রাণ বুড়ো গোপালদাদার কাজ ছিল এতই নিখুঁত ও সুচারু যে তাঁর কাজে কখনও কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যেত না। অতএব স্বামীজীর ভর্ৎসনাপাত্র হওয়ার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য কোনওটাই তাঁর হয়নি। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে সেটা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। আমৃত্যু এইভাবে অন্তরালে থেকে, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিরলস সেবাকাজ চালিয়ে যাওয়া গোপালদাদার মতো কর্মযোগীর পক্ষেই বোধকরি সম্ভব। এতৎসত্ত্বেও এই নিভৃতচারী ও সেবাপরায়ণ প্রবীণ সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। আর স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিবরণ তো নিতান্তই অপ্রতুল। এজন্য লেখকের আক্ষেপের সীমা নেই। তবুও প্রাপ্ত যৎসামান্য তথ্যগুলি লেখক সুদক্ষভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন।

১৮৯৫ সালে আমেরিকা থেকে স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘‘আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা।’’—এত বড় প্রশংসাবাক্য স্বামীজী যাঁর উদ্দেশে জানিয়েছেন, সেই ‘সারদা’ [সারদাপ্রসন্ন] তাঁর কনিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁর সঙ্গে স্বামীজীর ভালবাসাময় সম্পর্ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেবাব্রতী গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর দিব্য সম্পর্কের আলোচনা রয়েছে চতুর্দশ

অধ্যায়ে। গাজীপুর থেকে তাঁকে একটি চিঠিতে (ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০) স্বামীজী লিখেছিলেন, ''তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়।'' ব্রহ্মানন্দজীকে স্বামীজী চিঠিতে সম্বোধন করতেন এক অনন্য শব্দবন্ধ সহযোগে : 'অভিন্নহৃদয়েষু'। এ-সম্বোধনে সম্মানিত হওয়ার সৌভাগ্য অন্য কারও হয়নি। সেইরকম, অখণ্ডানন্দজীও সম্বোধিত হয়েছেন এক অপূর্ব বিবেকানন্দীয় শব্দবন্ধে—'প্রাণাধিকেষু'। পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বামী সুবোধানন্দজী ও বিজ্ঞানানন্দজীর সঙ্গে স্বামীজীর অসীম ভালবাসার সম্পর্ক বিবৃত হয়েছে।

বইটির শেষে আছে উপসংহার (Epilogue), তথ্যসূত্র, পরিশিষ্ট এবং লেখক পরিচিতি। 'পরিশিষ্ট'তে (পৃঃ ৩৭১) লেখক একটি সারণি দিয়েছেন। স্বামীজী ১৮৯০ সাল থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত তাঁর কোন গুরুভ্রাতাকে কটি চিঠি লিখেছেন তার একটি তালিকা পাওয়া যাবে এতে।

এবারে কয়েকটি ছোটখাট বিষয়ের দিকে লেখক-প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি বইটির নাম রেখেছেন—Vivekananda's Loving Relationship With His Brother Disciples. কিন্তু এখানে তাঁর আলোচ্য বিষয় স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের পারস্পরিক সম্পর্ক। তদনুসারে, বইটির নাম Vivekananda's Loving Relationship With His Monastic Brother Disciples হলেই ভাল হত। দ্বিতীয়ত এই ধরনের গবেষণাগ্রন্থে বইয়ের শেষে একটি বিস্তারিত বিষয়সূচি (subject-index) থাকা একান্ত আবশ্যক, যাতে আগ্রহী পাঠক তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয়টি অনায়াসে খুঁজে নিতে পারেন। এই বইয়ের একটি হার্ড বাউন্ড লাইব্রেরি সংস্করণ প্রকাশিত হলে ভাল হয়, কারণ এই ধরনের নরমপৃষ্ঠ (paperback) বই বেশিদিন ঠিকভাবে রাখা মুশকিল। এর একটি ভাল বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হওয়া দরকার।

আর একটি কথা। স্বামীজীর গৃহী গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের সংখ্যা (এবং মাহাত্ম্য) কিছু কম নয়। তাঁদের সঙ্গেও স্বামীজীর সুমধুর সম্পর্ক ছিল এবং সেইসব দিব্য সম্বন্ধের পবিত্র কাহিনিও সবিস্তার আলোচনার দাবি রাখে। স্বামীজীর নিজের দেশি-বিদেশি সন্ন্যাসী-গৃহী শিষ্যশিষ্যার সংখ্যাও অগণিত। এঁদের সকলের সঙ্গে স্বামীজীর সম্পর্ক কেমন ছিল সেই বিষয়েও সুপণ্ডিত লেখক ভাবনাচিন্তা ও গবেষণা করছেন নিশ্চয়ই। আমরা আশা করতে পারি যে তিনি এই সিরিজে আরও কিছু বই লিখে আমাদের ঋদ্ধ করবেন।

সবশেষে বক্তব্য, অতিমারির উপর্যুপরি আক্রমণে সমাজজীবনে এখন গভীর সংকট ঘনিয়েছে; ফলে আমাদের ব্যক্তিজীবন নানারকম অপ্রত্যাশিত সমস্যার আবর্তে পড়ে অসহায়ভাবে পাক খাচ্ছে। এখনই তো আমাদের চাই আলোকবর্ষী ও শক্তিদায়ী এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়। সেই পরম আশ্রয়ের নাম—স্বামী বিবেকানন্দ। তাই আলোচ্য বইটি স্বামীজীর সদাজিজ্ঞাসু ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে।

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ সম্পাদনা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *মহিমা তব উদ্ভাসিত* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ১৯৯৮) [নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, '*স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাদের সম্পর্ক*']

২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *সহাস্য বিবেকানন্দ*, (নবভারত পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৯৮০), পৃঃ ৭২-৭৩

৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ* (মন্ডল বুক হাউস : কলকাতা, ১৩৮৫), খণ্ড ৩, পৃঃ ৬

৪। দ্রঃ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১১) পৃঃ ৩৮-৩৯